সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৮

পঞ্চতন্ত্রে প্রাচীন ভারতের সমাজ : একটি পর্যালোচনা

তিতাস কুমার শীল*

সারসংক্ষেপ : প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বিষ্ণুশর্মা খুবই পরিচিত একটি নাম। তিনি রাজা অমরশক্তির তিন মূর্খ পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন। তাদের শিক্ষার জন্য তিনি গল্পাকারে সহজ ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গল্পগ্রন্থটি পঞ্চতন্ত্র নামে পরিচিত। পঞ্চতন্ত্রের রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক। বিষ্ণুশর্মা গল্পাকারে তৎকালীন মানুষের চিন্তা-ভাবনা, অর্থনীতি, রাজনীতি, নারীর অবস্থান, ন্যায়-অন্যায়, আচার-আচরণ প্রভৃতি বিষয় তুলে এনেছেন। যার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজচিত্র ফুটে ওঠে। আলোচ্য প্রবন্ধে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার চিত্র উপস্থাপনের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতে মহিলারোপ্য নামে এক নগর ছিল। ঐ নগরের রাজা ছিলেন অমরশক্তি। বসুশক্তি, উগ্রশক্তি ও অনেকশক্তি নামে তাঁর তিন পুত্র ছিল। তিন পুত্রই ছিল মূর্খ। লেখাপড়ায় কারোরই তেমন আগ্রহ নেই। তাই পুত্রদের নিয়ে রাজা খুব চিন্তিত ছিলেন। অবশেষে রাজা একদিন মন্ত্রীদের ডেকে পুত্রদের শিক্ষার ব্যাপারে একটা উপায় বের করার কথা বললেন। মন্ত্রী সুমতি পুত্রদের শিক্ষার জন্য বিষ্ণুশর্মার কথা বললেন। রাজা বিষ্ণুশর্মাকে রাজ দরবারে ডেকে আনলেন এবং পুত্রদের শিক্ষার বিনিময়ে তাঁকে প্রচুর দান করতে চাইলেন। বিষ্ণুশর্মা বললেন, "মহারাজ নাহং বিদ্যাবিক্রয়ং শাসনশতেনাপি করোমি" অর্থাৎ আমি একশ গ্রামের বিনিময়েও বিদ্যা বিক্রয় করব না। কিন্তু ছয়মাসের মধ্যে আমি আপনার পুত্রদের নীতিশাস্ত্রজ্ঞ করে তুলব। তিনি আরও বললেন, আশি বছর বয়স হয়েছে, ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। ছয় মাসের মধ্যে যদি আপনার ছেলেদের পণ্ডিত করে তুলতে না পারি তাহলে ভগবান আমাকে যেন স্বর্গের পথ না দেখান। বিষ্ণুশর্মার এই কঠিন প্রতিজ্ঞা শুনে রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা খুব খুশি হলেন। রাজা অমরশক্তি তাঁর পুত্রদের বিষ্ণুশর্মার হাতে সমর্পণ করলেন। বিষ্ণুশর্মা তাদের সানন্দে গ্রহণ করে শিক্ষার জন্য মিত্রভেদ (বন্ধুত্ব ভাঙা), মিত্রপ্রাপ্তি (বন্ধুলাভ), কাকোলূকীয় (কাক ও পেঁচা), লব্ধপ্রণাশ (পেয়ে হারানো) এবং অপরীক্ষিতকারক (না ভেবে কাজ করা) এই পাঁচটি তন্ত্র লিখলেন। এই

---

*সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i3.12

পাঁচটি তন্ত্র পঞ্চতন্ত্র নামে পরিচিত। পঞ্চতন্ত্রের প্রতিটি তন্ত্রে আছে একাধিক শিক্ষণীয় ছোটগল্প। মিত্রভেদে ২৩টি, মিত্রলাভে ৬টি, কাকোলূকীয়ে ১৪টি, লব্ধপ্রণাশে ১৭টি এবং অপরীক্ষিতকারকে ১৪টি। অর্থাৎ সর্বমোট গল্প আছে ৭৪টি।

সাহিত্য মানুষের জীবনচিত্র। জীবনের সঙ্গেই সাহিত্যের যোগ। জীবনকে নিয়েই সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশ। মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, বিচিত্র চিন্তা, আনন্দ-বেদনা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি ফুটে ওঠে সাহিত্যে। মানুষ তৈরি করে সাহিত্য, তাই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় মানুষের জীবন। পঞ্চতন্ত্রও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। বিষ্ণুশর্মা পঞ্চতন্ত্রে সমাজের জটিল বিষয়গুলোকে, মানুষের রহস্যময় চরিত্রকে সহজ-ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। তিনি পঞ্চতন্ত্রে গল্পের চরিত্র হিসেবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পশুপাখিকে ব্যবহার করেছেন। গল্পের মাধ্যমে সহজভাবে শিক্ষার গুরুত্ব, অর্থনীতি, সমাজনীতি, মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, রাজনীতি, ন্যায়-অন্যায়, আচার-ব্যবহার, গোপনীয় বিষয় খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন, যাতে ফুটে উঠেছে তৎকালীন সমাজচিত্র। এই প্রবন্ধে সেই সমাজচিত্র বা তৎকালীন সামাজিক অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিষ্ণুশর্মা তাঁর পঞ্চতন্ত্রে গল্পের মাধ্যমে বিদ্যার অপরিসীম গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন। মানুষের জীবন ও বিদ্যার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেই যথার্থ মানুষ হওয়া যায় না। মানুষকে বিদ্যা অর্জনের সাধনা করে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে হয়। জীবনের সফলতার জন্য তাই বিদ্যা অর্জন অপরিহার্য শর্ত। জীবন সুগঠন ও সুন্দরভাবে বিকাশের স্বার্থে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা না পেলে জাতির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, জাতি অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। সমাজ সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। তাই বলা হয় শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

বিদ্বান ব্যক্তি পারে একটি যুক্তিবাদী সমাজ, একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন করতে। বিদ্বান ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট কোনো দেশ নেই, পুরো পৃথিবী তাঁর কাছে একটি দেশ। সারা পৃথিবীর মানুষ তাঁকে সম্মান করে। পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে,

> বিদ্বত্ত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।
>
> স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে॥ মিত্রপ্রাপ্তি/৫৭
>
> (বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ২৯৯)
>
> অর্থাৎ বিদ্বান ও রাজা এই দুইয়ের মধ্যে কোনো তুলনা চলে না। রাজা শুধু স্বদেশে সম্মান পান কিন্তু বিদ্বান সর্বত্র সম্মানিত হন।

কিন্তু বিদ্যাহীন লোকের সমাজে কোনো মূল্য নেই। বিদ্যাশিক্ষার অভাবে সে অন্ধের মতো জীবন-যাপন করে। সমাজে সে বোঝাস্বরূপ। তার দ্বারা সমাজের ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকার হয় না। বিদ্যাহীন লোক বিশ্বস্ত হলেও তার দ্বারা উপকারের থেকে অপকারই বেশি হয়। পঞ্চতন্ত্রে তাই বলা হয়েছে,

পণ্ডিতোঽপি বরং শত্রুর্ন মূর্খো হিতকারকঃ।
বানরেণ হতো রাজা বিপ্রাশ্চৌরেণ রক্ষিতাঃ॥ মিত্রভেদ/৪২১

(বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ২৯১)

অর্থাৎ অশিক্ষিত হিতৈষী থেকে পণ্ডিত শত্রুও ভালো। (মূর্খ) বানরের দ্বারা রাজা নিহত হয়েছিলেন, আর (বুদ্ধিমান) চোরের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ রক্ষা পেয়েছিলেন।

মিত্রভেদ তন্ত্রে "রাজা ও বানর" গল্পে দেখা যাচ্ছে, এক রাজার এক বিশ্বস্ত বানর ছিল। একদিন বানরকে পাহারায় নিযুক্ত রেখে রাজা ঘুমোচ্ছেন। একটি মাছি এসে রাজার শরীরে বসেছে। বানর মাছি তাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু মাছি পুনরায় রাজার শরীরে বসেছে। তখন বানর মাছির ওপর রাগ করে ধারালো তরবারি দিয়ে মাছিকে দিল এক কোপ। আর সেই কোপ গিয়ে লাগল রাজার গলায়। রাজা মারা গেলেন। তাই পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে, অশিক্ষিত বিশ্বস্ত মানুষ থেকে পণ্ডিত শত্রুও অনেক ভালো। মূর্খরা বুঝে উঠতে পারে না কোনটা ভালো এবং কোনটা মন্দ। তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে চিরদিন আবদ্ধ থাকে। তাদের উপদেশ দিলেও তারা শোনে না। বরং সবসময় ক্ষতি করার চেষ্টা করে। পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে,

উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।
পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্ ॥ মিত্রভেদ/৩৯৩

(বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ২৮৬)

অর্থাৎ দুধ খেলে যেমন সাপের বিষই বাড়ে তেমনি অশিক্ষিত মানুষদের উপদেশ দিয়ে কোনো লাভ হয় না। তাতে তারা শান্ত হয় না, শুধু রাগান্বিত হয়।

তাছাড়া আমরা সমাজ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখি মূর্খদের মাঝে কোনো বিদ্বান মানুষ সহজে টিকে থাকতে পারে না। মূর্খরা বিভিন্নভাবে শিক্ষিত মানুষদের অপমান করে, অসম্মান করে। কাকোলূকীয় তন্ত্রের 'সিংহ ও শেয়াল গুহা' গল্পে রাজার সবচেয়ে শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান মন্ত্রী ছিলেন রক্তাক্ষ। অন্য মন্ত্রীরা রাজনীতি তেমন বুঝত না। তারা ছিল অশিক্ষিত, মূর্খ; কিন্তু মন্ত্রী। রাজা শেষ পর্যন্ত অশিক্ষিত মন্ত্রীদের কথাই শুনলেন। মনের দুঃখে রক্তাক্ষ পরিবার নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। ফলে রাজার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। মূর্খ মন্ত্রীদের কথা শুনে রাজার রাজত্ব শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। চাণক্যও তাঁর নীতিশাস্ত্রে মূর্খদের সম্পর্কে বলেছেন,

সর্বে মূর্খে দোষা হি কেবলম্॥ ২॥

(সত্যনারায়ণ, ১৯৯০ : ৪)

অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তি সকল দোষের আধার।

বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতৈরপি॥ ৮॥

(সত্যনারায়ণ, ১৯৯০ : ৮)

অর্থাৎ শত মূর্খ অপেক্ষা একজন গুণী পুত্র ভালো।

আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষের ধারণা, প্রাচীনকালে এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভালো ছিল। প্রাচীনকালে সমাজে ছিল সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন। সমাজে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য ছিল না। সবাই সুখে জীবন-যাপন করত। কিন্তু পঞ্চতন্ত্র পাঠে এই সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুশর্মা তাঁর পঞ্চতন্ত্রের অনেক জায়গায় দারিদ্র্যের কথা তুলে ধরেছেন। দরিদ্রদের সমাজে কোনো সম্মান নেই। পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে,

দংষ্ট্রাবিরহিতঃ সর্পো মদহীনো যথা গজঃ।
তথার্থেন বিহীনোঽত্র পুরুষো নামধারকঃ ॥ মিত্রপ্রাপ্তি/৮৮

(বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ৩০৪)

অর্থাৎ যেমন দাঁতহীন সাপ, মদহীন হাতি সেরূপ টাকাপয়সাহীন লোক নামেই পুরুষ, অর্থাৎ সমাজে কোনো মূল্য নেই।

প্রকৃতপক্ষে টাকাপয়সাহীন বা দরিদ্রকে সমাজ কখনও মূল্য দেয় না। তার সমাজে কোনো বন্ধু থাকে না। খুব কাছের আত্মীয়-স্বজনও তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায় না। এটাই সমাজের প্রকৃত চিত্র। অর্থ মানবজীবনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়, অর্থ ছাড়া সমাজে কেউ কাউকে মূল্যায়ন করে না। অর্থহীন ব্যক্তি জীবিত থাকলেও সে জীবন্মৃত। সমাজে দরিদ্রের কষ্টের শেষ নেই। এ সম্পর্কে চাণক্য বলেছেন,

সর্বকষ্টা দরিদ্রতা ॥৫৭॥

(সত্যনারায়ণ, ১৯৯০ : ৫৮)

অর্থাৎ সকল কষ্টের মূল দারিদ্র্য।

পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে,

ব্যথয়ন্তি পরং চেতো মনোরথশতৈর্জনাঃ।
নানুষ্ঠানৈর্ধনৈর্হীনাঃ কুলজা বিধবা ইব ॥
দৌর্গত্যং দেহিনাং দুঃখমপমানকরং পরম্।
যেন স্বৈরপি মন্যন্তে জীবন্তোঽপি মৃতা ইব ॥ মিত্রপ্রাপ্তি/৯৯-১০০

(বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ৩০৫)

অর্থাৎ সৎকুলেজাত বিধবার যেমন কোনো সাধ পূর্ণ হয় না তেমনি যার ধন নেই তার সাধও পূর্ণ হয় না। এই সাধগুলো শুধু মনের দুঃখ বাড়ায়। আত্মীয়-স্বজনও তাকে জীবন্মৃত মনে করে। ধন না থাকার কারণে তার অপমান-দুঃখ কিছুই থাকে না।

সংস্কৃত সাহিত্যে বিখ্যাত প্রকরণ মৃচ্ছকটিক। এখানে চারুদত্ত বিদূষককে বলেছিলেন,

দারিদ্র্যান্মরণাদ্বা মরণং মম রোচতে ন দারিদ্র্যম্।
অল্পক্লেশং মরণং দারিদ্র্যমনন্তকং দুঃখম্ ॥ ১/১১

(শূদ্রক, ২০০৭ : প্রথমোঽঙ্ক,২৭)

অর্থাৎ দারিদ্র্য ও মৃত্যুর মধ্যে মৃত্যুই উত্তম, কিন্তু দারিদ্র্য নয়। কারণ, মৃত্যুতে দুঃখ অনেক কম কিন্তু দারিদ্র্যে দুঃখ অনেক বেশি।

আমাদের বর্তমান সমাজ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখি, যাদের টাকা পয়সা আছে সমাজ তাদের ভিন্ন চোখে দেখে। সমাজের মানুষ তাদের অতিরিক্ত মূল্যায়ন করে। যার টাকা আছে সে শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভালো না হলেও সে সমাজে শক্তিমান। ধনীরা সমাজে যা বলে সকলে সেটা মেনে চলে। আর চাটুকারেরা সবসময় ধনীদের সাথে ছায়ার মতো লেগে থাকে। ধনীরা সমাজে অন্যায় কাজ করলেও টাকার জোরে নিস্তার পেয়ে যায়। সমাজের লোভী মানুষেরা সবসময় ধনীদের পক্ষে থাকে। টাকার কারণেই মানুষের তেজ, শক্তি বেড়ে যায়। তাই পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে,

ঊষ্মাপি বিত্তজো বৃদ্ধিং তেজো নয়তি দেহিনাম্।
কিং পুনস্তস্য সম্ভোগস্ত্যাগকর্মসমন্বিতঃ ॥ মিত্রপ্রাপ্তি/৬৯

(বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ৩০১)

অর্থাৎ কাছে যদি টাকা থাকে তাহলে টাকার গরমেই মানুষের তেজ বেড়ে যায়। সে টাকা দান-ধ্যান করে ভোগ করলে তো কথাই নেই।

প্রকৃতপক্ষে সমাজের অধিকাংশ মানুষ সব সময় স্বার্থপর। সমাজটাই আশ্চর্যজনকভাবে অর্থ বা বিত্তের ওপরে নির্ভরশীল। অর্থলালসার কারণে মানুষ হয়ে পড়ছে মনুষ্যত্বহীন। বিষ্ণুশর্মার কালেও সমাজে যেটা প্রত্যক্ষ করা যায়, আধুনিক যুগে এসেও সেই একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চতন্ত্রে আরও বলা হয়েছে,

ফলহীনং নৃপং ভৃত্যাঃ কুলীনমপি চোন্নতম্।
সংত্যজ্যান্যত্র গচ্ছন্তি শুষ্কং বৃক্ষমিবাণ্ডজাঃ ॥ মিত্রভেদ/১৫৩

(বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ২৫১)

গাছ শুকিয়ে গেলে অর্থাৎ মরা গাছে যেমন পাখি থাকে না তেমনি যে রাজার কাছে কোনো কিছু পাওয়ার আশা থাকে না, তার কাছেও কেউ থাকে না।

প্রাচীন সাহিত্যে সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় নারী খুব বেশি ভালো অবস্থানে ছিল না। পঞ্চতন্ত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে,

জল্পন্তি সার্ধমন্যেন পশ্যন্ত্যন্যং সবিভ্রমাঃ।
তদ্‌গতং চিন্তয়ন্ত্যন্যং প্রিয়ঃ কো নাম যোষিতাম্ ॥ মিত্রভেদ/১৩৬

(বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ২৪৯)

অর্থাৎ মেয়েরা গল্প করে একজনের সঙ্গে, তাকায় আরেক জনের দিকে আর মনে মনে ভাবে আরেক জনের কথা, মেয়েদের আবার প্রিয় কে ?

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় সমাজে নারীর প্রতি কেমন অবিশ্বাস ছিল। এই ধরনের উক্তি নারীর জন্য অবমাননাকর। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর সুস্পষ্ট কোনো অবস্থান নেই। সমাজে তার নিজের কোনো পরিচয় নেই। সমাজে নারী কখনও কন্যারূপে, কখনও বোন হিসেবে, কখনও পত্নী, আবার কখনও মা হিসেবে পরিচিত। পুরুষের মতো সেও যে সমাজের একজন মানুষ, তারও যে নিজস্ব সত্তা আছে, এ অনুভূতি উপেক্ষিত হয়েছে যুগে যুগে। প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়,

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥ মনুসংহিতা ৯/৩

(মানবেন্দু, ১৪১৬ : ৬৯৮)

অর্থাৎ কুমারী অবস্থায় নারীকে বাবা রক্ষা করে, যৌবনকালে বিবাহিত স্ত্রীকে স্বামী রক্ষা করে আর বৃদ্ধকালে পুত্রেরা রক্ষা করে। কোনো অবস্থাতেই নারী স্বাধীনতা পাবার যোগ্য নয়।

অর্থাৎ নারীর নিজস্ব স্বাধীনতা কোনো কালে ছিল না। ব্যতিক্রম নিঃসন্দেহে সমাজে ছিল; কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীকে সবসময় পুরুষের ওপর নির্ভর করতে হয়। অর্থাৎ পুরুষ ছাড়া নারীজীবন যেন বৃথা। আর যেহেতু নারী পুরুষের ওপর সর্বদা নির্ভরশীল তাই পুরুষ সবসময় নারীকে অসম্মান, অপমান করেছে। সমাজে নারীর প্রতি অবমাননাকর ব্যাপারগুলো আছে বলেই তার প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে সাহিত্যের পাতায়।

পঞ্চতন্ত্রে আছে,

অনৃতং সাহসং মায়া মূর্খত্বমতিলোভতা।
অশৌচং নির্দয়ত্বং চ স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজঃ ॥ মিত্রভেদ/১৯৬

(বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ২৫৬)

অর্থাৎ মিথ্যা হঠকারিতা বা দুঃসাহস, ছলনা করা, বোকামি করা, বেশি লোভ করা, অসাধুতা, নির্দয়তা স্ত্রীলোকের এসব দোষ তার স্বভাবদোষ।

প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা কথা বলা, দুঃসাহস, বোকামি করা, বেশি লোভ করা প্রভৃতি দোষগুলো নারী-পুরুষ সকলেরই আছে। কিন্তু সমাজ এই দোষগুলো শুধু নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। আমাদের বর্তমান সমাজ বিশ্লেষণে দেখি, অধিকাংশ পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্মলাভ পরিবার ভালোভাবে নেয় না। পরিবার প্রত্যাশা করে পুত্র সন্তানের। সমাজ নারীকে ভালোভাবে গ্রহণ করে না বলেই এই ধরনের প্রত্যাশা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্যেক মাতা-পিতা নিজের পুত্রের বিবাহের জন্য সুন্দরী পাত্রী প্রত্যাশা করে কিন্তু নিজের পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করুক সেটা চায় না। তাছাড়া কন্যা সন্তান জন্মালে সারাজীবন তার জন্য বাবা-মায়ের চিন্তার শেষ থাকে না। কন্যা বড়

হলে কার নিকট সম্প্রদান করবে, সে ভালো থাকবে কিনা প্রভৃতি ব্যাপারে বাবা-মা খুব চিন্তা করে। পঞ্চতন্ত্রেও আমরা বাবা-মার চিন্তার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি,

> পুত্রীতি জাতা মহতীহ চিন্তা কস্মৈ প্রদেয়েতি মহান্ বিতর্কঃ।
> দত্তা সুখং প্রাপ্স্যতি বা ন বেতি কন্যাপিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্ ॥ মিত্রভেদ/২০৫
>
> (বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ২৫৯)
>
> অর্থাৎ মেয়ে জন্মালে প্রচুর চিন্তা মাথায় আসে। বড় হলে কন্যাকে কার হাতে সমর্পণ করবে এটাও চিন্তার ব্যাপার। কন্যা সম্প্রদানের পর মেয়ে সুখী হবে কিনা এটা নিয়েও চিন্তার শেষ নেই। মেয়ের বাবা হওয়া সত্যিই কষ্টের।

এভাবেই নারীকে সবসময় সমাজে ছোট করে দেখা হয়। সমাজে সবসময় সে ঘৃণা, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের পাত্র। সমাজ সবসময় তাকে অবিশ্বাস করে, অসম্মান করে। লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে 'চড়ুই ও বানর' গল্পে রক্তমুখ নামক বানরের কণ্ঠে শুনি.

> "ন হি স্ত্রীণাং কথঞ্চিদ্ বিশ্বাসমুপগচ্ছেৎ।"
>
> (বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ৩৬৪)
>
> অর্থাৎ স্ত্রীলোককে কখনও বিশ্বাস করতে নেই।

নারী যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-চেতনায় এগিয়ে যেতে পারে এটা পুরুষশাসিত সমাজ মেনে নিতে পারে না। পুরুষের ধারণা সমাজে নারীদের জন্ম হয়েছে সন্তান উৎপাদন, রান্নাবান্না ও পুরুষের সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য। তারও যে পুরুষের মতো তার ইচ্ছামতো চলাফেরা, কল্পনা ও স্বপ্নের জগৎ থাকতে পারে এ ব্যাপারে সমাজ নীরব। সমাজ নীরব তাই সাহিত্য নীরব। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে "ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার মরে গরু"। এই প্রবাদ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় সমাজে নারীর অবস্থান কেমন? বউ মরলে নতুন করে বিয়ে করা যায়, সাথে পাওয়া যায় যৌতুক হিসেবে প্রচুর ধন-সম্পদ। সুতরাং ভাগ্যবান তো সেই পুরুষ যার বউ মারা গেছে। আর গরু মারা গেলে পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই সমাজে নারীর স্থান গরুর থেকেও নিচে। তবে সমাজে ব্যতিক্রম চিন্তা অবশ্যই আছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সমাজ নারীকে খুব ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। নারীকে যদি পুরুষের প্রয়োজন না হতো তাহলে সমাজ নারীকে আদৌ মেনে নিত কিনা সন্দেহ। তবে মা হিসেবে নারীকে সমাজ যুগে যুগে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে। পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে,

> মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
> অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥ লব্ধপ্রণাশ/৭৯
>
> (বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ৩৬১)
>
> অর্থাৎ মা যার ঘরে নেই, যার স্ত্রী ভালো ব্যবহার করে না তার বনে যাওয়া উচিত। কারণ তার কাছে বন ও ঘর সমান।

বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র পাঠে মনে হয় তৎকালীন সময়ে নারী-পুরুষের অবৈধ প্রণয় সমাজে একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রের 'তাঁতি বৌ ও শেয়ালনি' গল্পে

আমরা দেখি, তাঁতি বৌ চোর প্রেমিকের সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত ছিল এবং স্বামীকে রেখে প্রেমিকের হাত ধরে গৃহ ছাড়ল। কাকোলূকীয় তন্ত্রে 'ব্রাহ্মণ ও দুষ্টা ব্রাহ্মণী' গল্পে ব্রাহ্মণী ছিল অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত। মিত্রপ্রাপ্তি তন্ত্রের 'বণিক পুত্র ও রাজকন্যা' গল্পে দেখি, রাতের অন্ধকারে চৌকিদার তার প্রেয়সীর জন্য অপেক্ষা করছে, তার মেয়ে বিনয়াবতী অন্ধকারে তার প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করছে। মিত্রভেদ তন্ত্রের 'শেয়াল, গুরু ও দূতী' গল্পে তাঁতি বৌ তার স্বামীর চোখ ফাঁকি দিয়ে দেবদত্তের সাথে প্রণয়ে লিপ্ত ছিল।

তবে এই অবৈধ প্রণয় পঞ্চতন্ত্রের সমাজে নতুন নয়। সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদেও আমরা উপপতির কথা পাই। এখানে উপমার দ্বারা উপপতির কথা বলা হয়েছে। আর উপমাগুলো সব সময় সমাজ থেকে নেয়া হয়। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে,

> যদাদীধ্যে ন দবিষাণ্যেভিঃ পরায়দ্ভ্যোঽব হীয়ে সখিভ্যঃ।
> ন্যুপ্তাশ্চ বভ্রবো বাচমক্রতঁ এমীদেষাং নিষ্কৃতং জারিণীব ॥ ঋক্/১০/৩৪/০৫
>
> (রমেশচন্দ্র, ২০০০ : ৪৮৫)

> অর্থাৎ আমি যখন মনে মনে ভাবি, আর এই পাশা খেলা করব না তখন খেলার সঙ্গীদের দেখলে তাদের নিকট হতে সরে যাই, কিন্তু পাশাগুলি সুন্দর পিঙ্গলমূর্তিতে ছকের ওপর বসে আছে দেখে আর থাকতে পারি না। যেরূপ ভ্রষ্টা নারী উপপতির নিকট গমন করে আমিও সেরূপ খেলার সঙ্গীদের নিকটে গমন করি।

এ সম্পর্কে চাণক্য বলেছেন,

> বিষং স্ত্রিয়োঽপ্যন্যহৃদো বিষম্॥ ৯৫॥
>
> (সত্যনারায়ণ, ১৯৯০ : ৯১)

> অর্থাৎ যে স্ত্রী পরপুরুষের প্রতি আসক্ত সে স্ত্রী বিষের মতো।

পঞ্চতন্ত্রেও বলা হয়েছে,

> দুর্দিবসে ঘনতিমিরে দুঃসঞ্চারাসু নগরবীথীষু।
> পত্যুর্বিদেশগমনে পরমসুখং জঘনচপলায়াঃ ॥ মিত্রভেদ/১৭৪
>
> (বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ২৫৪)

> অর্থাৎ বর্ষার দিনে চারদিকে ঘন অন্ধকারে পথে চলা খুব কষ্টকর। স্বামী দূরে কোথাও যাচ্ছে তাই খারাপ মেয়ের মন আনন্দে নাচে।

তবে পরকীয়ার ক্ষেত্রে পঞ্চতন্ত্রে কোথাও পুরুষের দোষ দেয়া হয়নি। এখানে বলা হয়েছে, পতি দূরে কোথাও যাচ্ছে, রাতে বাড়ি ফিরবে না, তাই ভ্রষ্টানারী আনন্দে নাচে। এখানে শুধু মেয়েই আনন্দে নাচবে না, তার প্রেমিকেরও আনন্দে নাচার কথা। আর নারী যদি পর পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়, এক্ষেত্রে পুরুষও তো পরনারীর প্রতি আসক্ত হয়। অতএব অপরাধ হলে উভয়েই সমান অপরাধী। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রে পরকীয়ার

ক্ষেত্রে সব দোষই নারীদের উপর পড়েছে। কারণ সমাজ পুরুষশাসিত আর সাহিত্যগুলো রচিত হয়েছে পুরুষদের দ্বারা।

আমরা বাজার থেকে যখন কোনো পোশাক কিনি তখন সেটা আমাদের পছন্দ মতোই কিনি। পছন্দ না হলে আমরা কিনি না। এই পোশাক হয়তো দুই তিন বছর পরিধান করা যেতে পারে। কিন্তু যাকে সারা জীবনের জন্য সঙ্গী নির্বাচন করি সেটা আমাদের পছন্দমতো বেছে নেওয়ার প্রথা আজও আমাদের সমাজে পুরোপুরি চালু হয়নি। নারী-পুরুষের নিজেদের পছন্দের বিয়ে আজও সমাজ উপেক্ষা করছে। এক্ষেত্রে সমাজের মুরব্বিদের বক্তব্য ওরা ছোট ছেলে-মেয়ে। ওরা কী বোঝে? কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, যারা সারাজীবন একত্রে থাকবে, যারা একত্রে সংসার করবে তাদের মত উপেক্ষিত। তবে পঞ্চতন্ত্রের সমাজে মনে হয় জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার ব্যাপারে নারী-পুরুষের মতামতের প্রাধান্য সমাজে চালু ছিল। লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রের 'মুনিত্রয়' গল্পে দেখা যায়, মুনি বিয়ের ব্যাপারে কন্যার মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে কন্যার বিয়ের জন্য সূর্যদেবকে এনেছিলেন, সূর্যদেব অনেক প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও কন্যার পছন্দ হয়নি। তারপর তিনি মেঘ, বায়ুদেব, গিরিরাজকে কন্যার জন্য এনেছিলেন। কিন্তু কন্যার কাউকে পছন্দ হয়নি। শেষ পর্যন্ত কন্যার পছন্দ হয়েছিল ইঁদুরকে। মুনি ইঁদুরের হাতে নিজের কন্যাকে সমর্পণ করলেন। মিত্রপ্রাপ্তি তন্ত্রে 'বণিকপুত্র ও রাজকন্যা' গল্পে রাজা চৌকিদারের সাথে তার প্রেয়সীর, বিনয়াবতীর সঙ্গে তার প্রেমিকের, রাজকন্যার সাথে বণিকপুত্রের বিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিয়েগুলো ছেলে-মেয়েদের নিজেদের পছন্দমতো ছিল।

আমাদের সমাজের বেশিরভাগ মানুষের মনে ধারণা বিরাজ করে যে, সাধু-সন্ন্যাসীরা খুব ভালো মানুষ। তাঁরা সবসময় ধর্ম-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। পারিবারিক জীবন, অর্থ, সম্পদের প্রতি তাদের কোনো মোহ নেই। স্রষ্টার চিন্তায়, স্রষ্টাকে কাছে পাওয়ার জন্য তাঁরা ব্যাকুল। তাই সমাজের অধিকাংশ মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীর জীবন নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ সাধু ব্যক্তিই ভণ্ড। বর্তমানযুগে আমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সাধু-সজ্জনদের বিভিন্ন কুকীর্তির তথ্য পাই। পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে,

নদীনাং চ কুলানাং চ মুনীনাং চ মহাত্মনাম্।
পরীক্ষা ন প্রকর্তব্যা স্ত্রীণাং দুশ্চরিতস্য চ ॥ লব্ধপ্রণাশ/৪৯

(বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ৩৫৬)

অর্থাৎ নদী, বংশ, সাধুব্যক্তি ও নারীদের পাপ কাজ পরীক্ষা করতে নেই।

পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে, সাধু-সন্ন্যাসীদের পরীক্ষা করতে নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, পূর্বে এরা অনেক অপকর্ম করেছে এবং সেই অপকর্ম ঢাকতে গিয়ে সাধু

সেজেছে। সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবন সমাজের স্বাভাবিক জীবন নয়। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, সমাজে স্বাভাবিক জীবন থেকে মানুষ যখন অস্বাভাবিক জীবনের দিকে ধাবিত হয় তখন সেখানে কিছু না কিছু রহস্য থাকে। হয়তো জীবনে কোনো গুরুতর অপরাধ কিংবা এমন কোনো মানসিক আঘাত পেয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। ব্যতিক্রম নিঃসন্দেহে সমাজে আছে অর্থাৎ অনেক ভালো সাধুও সমাজে আছে যাঁরা শুধু স্রষ্টাকে ভালোবেসেই সাধু হয়েছে । অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রের প্রথম গল্পে আমরা দেখি, নাপিত যখন জৈনাশ্রমে গিয়ে সাধুকে তার বাড়িতে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করল তখন সাধু রাজি হলো না, কিন্তু পরে যখন নাপিত বলল, আপনাকে দেওয়ার জন্য কিছু দামি কাপড় ও অনেক দক্ষিণা জমিয়ে রেখেছি। তখন কাপড় ও টাকার কথা শুনে সাধুর মন গলে গেল, সাধু যেতে রাজি হলো। পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে,

> একাকী গৃহসন্ত্যক্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ।
>
> সেঽপি সংবাহ্যতে লোকে তৃষ্ণয়া পশ্য কৌতুকম্ ॥ অপরীক্ষিতকারক/১৫
>
> (বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ৩৭০)
>
> অর্থাৎ যার বেশ দিগম্বর, ঘর-বাড়ি কিছুই নেই। কিন্তু তারও লোভ রয়েছে, দুনিয়াটা আসলে আজব জায়গা।

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু"। লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে। মানুষ নিজের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। তার নিকট যা থাকে তাতে সুখী না হয়ে আরও বেশি কিছু পাওয়ার ইচ্ছা মানুষের থাকে। এই অতিরিক্ত পাওয়ার ইচ্ছাই লোভ। এই লোভের কারণে মানুষ বিভিন্ন অন্যায় কর্মে জড়িয়ে পড়ে। পঞ্চতন্ত্রে আমরা এই ধরনের লোভী মানুষ দেখতে পাই যাদের লোভের কারণে মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। মিত্রভেদ তন্ত্রের 'ব্রাহ্মণ ও বণিক' গল্পে লোভের কারণেই কিরাতদের হাতে ব্রাহ্মণ মারা পড়ল।[১] অপরীক্ষিত কারক তন্ত্রে 'ব্রাহ্মণ ও ছাতুর ঘট' গল্পে ব্রাহ্মণের অতিরিক্ত লোভের কারণে তার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।[২] অর্থাৎ লোভী মানুষ সব কালেই সমাজে বিদ্যমান। লোভী মানুষের নিজের কর্মকাণ্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং লোভের পরিমাণ সম্পর্কেও সে চিন্তা করে না। লোভে পড়ে মানুষ সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যায় এবং ধ্বংস বা মৃত্যুতে গিয়ে তার জীবনের অবসান ঘটে। পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে,

> "লোভাচ্চ নান্যেঽস্তি রিপুঃ পৃথিব্যাম্"। মিত্রপ্রাপ্তি/১৬২
>
> (বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪: ৩১৩)
>
> অর্থাৎ লোভের মতো শত্রু এই পৃথিবীতে নেই।

আমরা মাঝে মাঝে সমাজের কিছু মানুষের আচরণে হতাশ হয়ে পড়ি। ভাবি মানুষ এত নিচে নামতে পারে? যাকেই বিশ্বাস করা হয় সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করে। এ জন্য

আমরা দোষ দেই বর্তমান কালকে। আমরা ধারণা করি বর্তমান মানুষের মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ, শিষ্টাচার, সহিষ্ণুতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি মানবীয় গুণ লোপ পেয়েছে। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রের সমাজ বিশ্লেষণে দেখি ঐ সময়েও সমাজে একই রকম চিত্র বিরাজমান। পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে,

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে ঽপি ন বিশ্বসেৎ।
বিশ্বাসাদ্ ভয়মুৎপন্নং মূলান্যপি নিকৃন্ততি ॥ মিত্রপ্রাপ্তি/৪৩

(বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪: ২৯৭)

অর্থাৎ অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করবে না, বিশ্বাসীকেও বিশ্বাস করবে না, বিশ্বাস থেকেই ভয়ের সৃষ্টি হয় এবং সব শেষ হয়ে যায়।

পরের শ্লোকে আবার বলা হয়েছে,

ন বধ্যতে হ্যবিশ্বস্তো দুর্বলোঽপি বলোৎকটৈঃ।
বিশ্বস্তাশ্চাশু বধ্যন্তে বলবন্তোঽপি দুর্বলৈঃ ॥ মিত্রপ্রাপ্তি/৪৪

(বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪: ২৯৭)

অর্থাৎ যে কাউকে বিশ্বাস করে না সে যদি দুর্বল ব্যক্তিও হয় তাহলেও শক্তিশালী ব্যক্তিরা তাকে ধ্বংস করতে পারে না। কিন্তু যারা সব সময় মানুষকে বিশ্বাস করে তারা শক্তিশালী হলেও দুর্বল ব্যক্তিদের কাছে পরাজিত হয়।

অর্থাৎ মানুষকে পুরোপুরি বিশ্বাসের যুগ কোনো কালেই ছিল না। চিরকালই সমাজে অবিশ্বাস, বিশ্বাস-ঘাতকতা, হিংসা-বিদ্বেষ, কথা দিয়ে কথা না রাখা প্রভৃতি বিষয় ছিল। মিত্রভেদ তন্ত্রের 'জীর্ণধন ও শ্রেষ্ঠী' গল্পে বিষ্ণুশর্মা সমাজের চিরদিনের বাস্তবতাকে সাহিত্যের পাতায় তুলে এনেছেন। পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে,

প্রায়েণাত্র কুলান্বিতং কুকুলজাঃ শ্রীবল্লভং দুর্ভগা
দাতারং কৃপণা ঋজূননৃজবো বিত্তে স্থিতং নির্ধনাঃ।
বৈরূপ্যোপহতাশ্চ কান্তবপূষং ধর্মাশ্রয়ং পাপিনো
নানাশাস্ত্রবিচক্ষণং চ পুরুষং নিন্দন্তি মূর্খাঃ সদা ॥ মিত্রভেদ/৪১৯

(বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ২৯০-৯১)

অর্থাৎ নিচ বংশে যার জন্ম সে কুলীনকে হিংসা করে, ভাগ্যবানকে দুর্ভাগা, যিনি দান করেন তাঁকে কৃপণ, ধনীকে গরীব, ভালো মানুষকে খারাপ মানুষ, সুপুরুষকে কুপুরুষ, ধার্মিককে অধার্মিক, জ্ঞানী মানুষকে অশিক্ষিত মানুষ সব সময় হিংসা করে।

এটা মূলত মানুষের চিরদিনের স্বভাব। বর্তমান সমাজে এই শ্লোকের সত্যতা আরও বেশি পরিলক্ষিত হয়।

পিতা-মাতার কাছে সব থেকে আদরের তার সন্তান। বাবা-মায়ের এই ভালোবাসার কোনো তুলনা হয় না। বাবা-মা সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তার সন্তানকে বুকে

আগলে রাখেন। স্নেহের বাঁধনে সন্তানকে আবদ্ধ রাখেন। কিন্তু অতিস্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল বয়ে আনে। সন্তান হয়ে পড়ে উচ্ছৃঙ্খল। সে তখন কোনো কথা শোনে না, কাউকে মূল্য দেয় না। অতি স্নেহের কারণে বেপরোয়া এই সন্তানকে অনেক সময় চরম মূল্য দিতে হয়। এটা বর্তমান সমাজের একটি স্বাভাবিক চিত্র। পঞ্চতন্ত্রের লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে 'সিংহ ও উট' গল্পে উট শাবকের ক্ষেত্রে দেখা যায় অতি আদরের ফলে সে বেয়াড়া হয়েছিল। কাউকে সে মূল্য দিত না। পরিশেষে অকালেই তার প্রাণ যায়। অর্থাৎ বেশি আদরের ফলে সন্তানের বিপথে গমন সব কালেই বিদ্যমান।

পঞ্চতন্ত্রে আমরা দেখি, সমাজে চুরি-ডাকাতি ছিল। মিত্রভেদ তন্ত্রের 'ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি' গল্পে বিদেশ গিয়ে ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি এই দুই বন্ধু অনেক অর্থ উপার্জন করেছিল। পরে কৌশলে পাপবুদ্ধি সমস্ত অর্থ চুরি করে নেয়। শেষে পাপবুদ্ধি ধরা পড়ে এবং বিচারে তাকে শূলে চড়ানো হয়। অপরীক্ষিতকারক তন্ত্রে আমরা 'গাধার গান' গল্পে দেখি, গাধা ও শেয়াল পরের ক্ষেতে ঢুকে ইচ্ছামতো চুরি করে কাঁকুড় খায়। কাঁকুড় খেতে গিয়ে জোছনালোকিত রাত দেখে গাধা গান গাইতে চাইলে শেয়াল তাকে বলে যে, যারা চুরি করতে আসে তাদের কথা বলতে নেই, চোর আর অবৈধ প্রণয়ীকে ঘাপটি মেরে থাকতে হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, সমাজে চোর ছিল। মিত্রভেদ তন্ত্রের 'ব্রাহ্মণ ও বণিক' গল্পে বণিকরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু পথে তারা ডাকাত কিরাতদের খপ্পরে পড়ে। তাই বলা যায়, পঞ্চতন্ত্রের সমাজে চুরি-ডাকাতি ছিল।

আমাদের এই উপমহাদেশের মানুষ চিরকালই অতিথিপরায়ণ। অতিথিকে সেবা করা পরম ধর্মের কাজ মনে করা হয়। অতিথি নারায়ণতুল্য। এই অতিথিসেবা শত শত বছর ধরে আমাদের এই উপমহাদেশে চলে আসছে। মিত্রভেদ তন্ত্রে 'শেয়াল, গুরু ও দূতী' গল্পে গুরু যখন আশ্রয়ের জন্য তাঁতির কাছে আসলেন, তাঁতি তখন অতিথিকে গৃহে নিয়ে হাত-পা ধোয়ানো, ভোজন করানো, শয়নের জন্য বিছানা করে দেওয়া এবং ভালোভাবে যত্ন করার কথা স্ত্রীকে বলল।[৩] বাংলার ঘরে ঘরে আজও অতিথি আসলে গৃহকর্তার যতটুকু সামর্থ্য আছে ততটুকু দিয়ে তার সেবা করা হয়। আমাদের সমাজে দেখা যায়, গৃহস্থের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না থাকলেও গৃহে অতিথি আসলে ধার-দেনা করে অতিথির সেবা করে। আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি কথা আছে, যদি কেউ অতিথির সেবা না করে তবে অতিথি তার পাপ দিয়ে যায় এবং গৃহস্থের সমস্ত পুণ্য নিয়ে নেয়। পঞ্চতন্ত্রেও আমরা এই ধরনের উক্তি দেখি,

> যঃ সায়মতিথিং প্রাপ্তং যথাশক্তি ন পূজয়েৎ।
> তস্যাসৌ দুষ্কৃতং দত্ত্বা সুকৃতং চাপকর্ষতি ॥ কাকোলূকীয়/১৫৪
>
> (বিষ্ণুশর্মা, ২০১৪ : ৩৩৪)

অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে অতিথি এলে যে সঠিকভাবে আপ্যায়ন করে না, অতিথি তার পাপ তাকে দিয়ে দেয় এবং তার সমস্ত পুণ্য নিয়ে নেয়।

আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান পৃথিবীকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। মহাকাশ থেকে সমুদ্রতল পর্যন্ত হয়েছে মানুষের বিচরণ ক্ষেত্র। বিজ্ঞান আমাদের সভ্যতাকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সমাজে চিন্তার জগতে নতুন ঢেউ খুব বেশি লেগেছে বলে মনে হয় না। বিষ্ণুশর্মা তাঁর পঞ্চতন্ত্রে সমাজের অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন যা বর্তমান সময়েও বিন্দুমাত্র পাল্টায়নি। আর পাঁচটা সমাজে যেমন আদর্শবাদ থাকে তেমনি পঞ্চতন্ত্রের সমাজেও ছিল। আবার এখানে শঠতা, ক্রূরতা, ব্যসন, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, তাচ্ছিল্য, প্রতিহিংসা, বহুস্বার্থের সংঘাত প্রভৃতিও ছিল। এখানে রাজা থেকে চণ্ডাল, শিশু থেকে বৃদ্ধ, ধনী থেকে দরিদ্র, সজ্জন থেকে দুর্জন প্রভৃতি নানা ধরনের মানুষের ভাষা রয়েছে। অর্থাৎ এখানে পাই সমাজের সজীব মানুষ। এখানকার গল্পগুলো সব ঐহিক, জীবনমুখী। আধ্যাত্মিকতার বালাই তেমন নেই। গল্পে অবিশ্বাস্য ও অতিনৈতিকতাকে পরিহার করা হয়েছে। এখানে গুরুর প্রতি ভক্তির কথা যেমন আছে, তেমনি অতিভক্তি দেখিয়ে বিশ্বাস অর্জন করে তারপর সর্বনাশ করার ব্যাপারও আছে। তাছাড়া প্রতিহিংসা মনের মধ্যে গেঁথে রেখে সুযোগ বুঝে প্রতিশোধ নেওয়ার কথাও রয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, পঞ্চতন্ত্র ও আধুনিক সমাজের মধ্যে মানুষের চিন্তাভাবনায় পার্থক্য তেমন নেই।

গ্রন্থপঞ্জি

বিষ্ণুশর্মা (২০১০)। দুলাল ভৌমিক অনূদিত *পঞ্চতন্ত্র*, সাহিত্য বিলাস, একুশে বইমেলা

বিষ্ণুশর্মা (২০১৪)। প্রসূন বসু সম্পাদিত, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* (১৫ খণ্ড), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী অনূদিত ও সম্পাদিত (১৪১৬), *মনুসংহিতা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত (২০০০)। *ঋগ্বেদ-সংহিতা* [দ্বিতীয় খণ্ড], হরফ প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা

শূদ্রক (২০০৭)। উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *মৃচ্ছকটিকম্*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা

সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত (১৯৯০)। *চাণক্য-নীতি-শাস্ত্রম্*, প্রথম সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা